অনালোচিত শৈলবালা ঘোষজায়া

ইয়াসমিন সুলতানা

বৈদিক যুগের আদি পর্বে নারীরা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করেছে। প্রাচীনযুগ থেকে মধ্যযুগে, তাদের অবস্থার অবনতি আর কয়েকজন সমাজ সংস্কারকের প্রচেষ্টায় আবার সমমর্যাদার অধিকারে উত্তরণের ইতিহাস বেশ ঘটনাবহুল। নারীর অধিকার নিয়ে প্রথম সোরগোল তৈরি হয় ১৭৯২ সাল বা তারও কিছু আগে, যখন মেরি ওলস্টোনকাস্ট (১৭৫৯-১৭৯৭) তাঁর 'নারীর অধিকার কেন্দ্রিক যৌক্তিকতা' (A Vindication of the Rights of Woman) আর্টিকলটি প্রকাশ করেন। নারীবাদী চিন্তাধারার পদ্ধতিগুলো, সুসংহত ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন ইলেন সোল্টার (Elaine Showalter)। এগুলোর মধ্যে প্রধান হল : সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, শারীরতত্ত্বীয় গঠন, বিবর্তনবাদ, চিন্তনজগৎ, মনোজগৎ, মনোবিশ্লেষণ, লিঙ্গভেদ, জ্ঞান ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া, সর্বশেষ স্ত্রীবাদী ভাবনা।

সময়ের সঙ্গে সমাজের যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের মর্যাদার আসন ক্ষুণ্ণ ও পরিবর্তিত হয়েছে। আজও নানা সংস্কারবশত পুরুষশাসিত সমাজে নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে না। এই প্রগতিশীল নারীর পক্ষে বিশ শতকে যা হয়ত কঠিন ছিল, আজ একুশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আরও বিকশিত হলেও জীবনযাত্রার সীমানায় নারী পিছিয়ে। অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত, তাদের নেই নির্ভয়ে চলাফেরার পরিবেশ, নেই নিরাপত্তা। নর-নারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পৃথিবীকে উন্নয়নের পথে নিতে হলে উভয়ের যুক্ত প্রয়াসও অনস্বীকার্য। একসময় যে আমেরিকায় 'নারীবাদী' চিন্তা ও কর্মকে মানসিক অস্থিরতা রোগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, আজ তারাই উন্নতির প্রথম ধাপে এগিয়ে চলছে। বিশ্বজগতে বিধাতার কী দারুণ লীলা-খেলা। আজকে সেই অবহেলিত নারীরাই নিজেদের যোগ্যতায় পুরুষের পাশে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'[১] প্রকৃতপক্ষে যদি একত্র হয়ে কাজ করা না যায় তাহলে সমাজ ও সংসারের উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়। আমাদের এই পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরা যদি তাদের আত্মম্ভরিতা বজায় রাখে, তাহলে উন্নয়ন নামক চিন্তা কেবল মরীচিকাই হয়ে উঠবে। জীবন, কর্ম, সাহিত্য সবকিছুতে নারীদের সৃজনশীল হাতের স্পর্শ রয়েছে।

রবীন্দ্র যুগের বা রবিপন্থীদের সঙ্গে কল্লোল যুগের (১৯২৩) সাহিত্যিকরা এগিয়ে চলছিলেন পাল্লা দিয়ে। ঠিক এই সময় নিরতিশয় বৈশিষ্ট্য সন্ধানী নারী শৈলবালা ঘোষজায়া উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে পদার্পণ করেন। যদিও আজ আমরা অনেকেই এই নামের সঙ্গে পরিচিত নই। গল্প-উপন্যাসের আলোচনায় তাঁর

অবদান দু'এক লাইনে বর্ণনা করেই গবেষকেরা তাঁদের দায় শেষ করেছেন। অথচ এই লেখিকা তাঁর ভেতরের অকল্পনীয় স্বপ্নবাস্তবতা আর মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে সমাজের শুভ-অশুভ রীতিনীতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। শান্ত ও প্রগতিশীল লেখিকার ছোটগল্প 'বীণার সমাধি' দিয়ে সাহিত্যের যাত্রা শুরু হলেও উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, শিশুতোষ গল্প, রহস্যগ্রন্থ, গবেষণামূলক নিবন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে তাঁর মনন ও চিন্তাধারা। মূলত নতুনত্বের অনুধ্যানে তিনি পিতৃপ্রদত্ত নাম আড়ালে রেখেই 'শৈলবালা ঘোষজায়া' এই সাহিত্যিক নামে পাঠক মহলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের মধ্যে যেমন নানারূপ বৈচিত্রের স্পর্শ পাই, কর্মে পাই গতি আর অভিজ্ঞতা, তেমনই সৃষ্টিতেও মেলে বহুজ্ঞ পুরুষের দর্শন ও চিন্তার সমাহার।

শৈলবালা ঘোষজায়ার কোনও পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ বা আত্মজীবনীমূলক ডায়েরি পাওয়া যায়নি। তবে কয়েক বছর আগে প্রকাশিত 'শেখ আন্দু'র বিশেষ সংস্করণের ভূমিকায় শিবনারায়ণ রায়ের আলোচনা থেকে জানা যায় শৈলবালা ঘোষজায়ার বাবা কুঞ্জবিহারী নন্দী অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম হেমাঙ্গিনী দেবী। তিনি কোন্নগরের মেয়ে। পূজ্যপাদ শ্রীঅরবিন্দ হেমাঙ্গিনী দেবীর জ্ঞাতি ভাই। চাকুরি সূত্রে তিনি যখন চট্টগ্রামের কক্সবাজারে বাস করতেন তখন, রবীন্দ্রনাথের জন্মের ঠিক ৩৩ বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৯৪, ২রা মার্চ শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্ম হয়। এখন থেকে প্রায় ১৩০ বছর আগে। সেই সময় বঙ্গসাহিত্যে এক ঝাঁক লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছিল। শৈলবালা ঘোষজায়ার পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমানে। সেখানে তিনি রাজবালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনার প্রসঙ্গে তিনি 'পাঠশালার স্মৃতি' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) নামক গল্পে উল্লেখ করেন :

> কিন্তু সৌভাগ্যবশত বর্ধমান রাজবংশের বদান্যতায় আমরা শৈশবে যে পাঠশালায় পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, সেখানকার সুমধুর স্মৃতি আজও আমার মনকে শ্রদ্ধাবহ আনন্দ মাধুর্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ধমান রাজবাড়ির উত্তরে 'শূলীপুকুর'। ঢেউ-খেলানো প্রাচীর শোভিত এই পুষ্করিণীর পূর্ব কোণে ছিল আমাদের আদরের পাঠশালা — নাম ছিল তৎকালে — 'রাজবালিকা বিদ্যালয়'।[২]

লেখিকা তাঁর শৈশবের পাঠশালার সুখস্মৃতিগুলো ভুলতে পারেননি তারই প্রমাণ 'পাঠশালার স্মৃতি' নামক গল্পটি। শৈশব থেকেই তিনি লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। ক্লাসে সব সময় প্রথম স্থান অধিকার করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, 'আজও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমস্ত পাতা চোখের সামনে দর্পণের মত দেখতে পাই।'[৩]

প্রতিভাবান প্রগতিশীল লেখিকা ছোটবেলা থেকে পিতৃগৃহের মিশ্র-সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দীর অপরিসীম ভূমিকায় তাঁর মনোজগৎ লেখক হওয়ার স্বপ্নের সিঁড়ি গড়ে তোলে। সাহিত্য সংস্কৃতিতে, ব্যক্তিত্ব গঠনে তথা মানসিকতা তৈরিতে পিতার সহায়তা অকৃপণ ছিল। অথচ তাঁরাই কিনা সমাজের অবৈজ্ঞানিক রীতিনীতির কাছে অবনত হয়ে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মেয়ের বিয়ে দেন। ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন পাশ হওয়ার আগেই ১৯০৮-এ (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামের ঘোষ পরিবারে তাঁর বিয়ে দেন। স্বামীর নাম নরেন্দ্রমোহন ঘোষ। সেখানে বিরাট একান্নবর্তী ও রক্ষণশীল হিন্দু পরিবার। শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে লেখিকা নিজেই বলেন, 'এগ্রিকালচারকেই এরা কালচার হিসেবে মেনে নেন।'[৪] স্বামী নরেন্দ্রমোহন একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বউয়ের ভাই ডাক্তারি পড়ছেন দেখে তিনি ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তখন তিনি ইউহান সাহেবের হোমিও কলেজে হোমিওপ্যাথি পড়া আরম্ভ করলেন এবং পাশও করলেন।

লেখিকা তাঁর স্বামীর পড়ার খরচ তাঁর লেখালিখির আয় থেকেই চালাতেন। পিতার মৃত্যুতে শোকাহত

হৃদয়ে সাহিত্যচর্চায় আরও নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে লেখাপড়া করার কারণে তিনি শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করেন। শ্বশুরালয়ে লেখিকাকে নানা কৌশল অবলম্বন করে সাহিত্যসৃষ্টি করতে হত।

শৈলবালা ঘোষজায়া মাত্র ২০ বছর বয়সে 'শেখ আন্দু' উপন্যাসটি লেখেন। তার আগে অবশ্য 'বীণার সমাধি' শিরোনামে ছোটগল্প লিখে পুরস্কার লাভ করেন।

কল্পনাপ্রবণ মন ও বাস্তবজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা শুরু হয় লেখিকার। তিনি বাস্তবতাকে সামনে রেখে কল্পশক্তি দিয়ে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে এনেছেন নতুনত্ব। জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) সাহিত্যকর্মের সঙ্গে শৈলবালা ঘোষজায়ার এই স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট এবং সাদৃশ্যপূর্ণ।

দার্শনিক সেন্ট টমাস আকুইনাস (১২২৫-১২৭৪) যেমন বিবাহবহির্ভূত যৌনতাকে সমর্থন করেননি তেমনি লেখিকাও সমর্থন করেননি। সেজন্য তাঁর রচনায় এই বিষয়টি বিবাহিত মানব-মানবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। লেখিকার সাহিত্যসৃষ্টিতে আকুইনাস ও দেকার্ত (১৫৯৬)-এর দার্শনিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। কেননা লেখিকার সাহিত্যকর্মে দেখা যায়, কোনও কিছু পরিষ্কারভাবে এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত সেটাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় না। মনের ওপর কোনও হাত নেই। মন কখনও কাউকে ভালবাসতে চায়, আবার কাউকে ভালবাসতে চায় না। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে আবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। কোনও কিছুরই হাত থাকে না মনের ওপর। আর নারীর মন, তা থাকলেই কী বা না-থাকলেই কী? তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম নেই। এ প্রসঙ্গে লেখিকার ভাষ্য :

> উনি সেদিন শুভক্ষণে আমার ঘরে পদার্পণ করেছিলেন, যে শুভক্ষণটায় মাহেন্দ্র যোগই ছিল কি, অমৃত যোগই ছিল, ঠিক জানিনে, কিন্তু একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব যোগ ছিল, তার কোন সন্দেহ নাই। কারণ তারপর থেকেই দেখা গেল, এতদিন বৈরাগ্য আসক্তির উদগ্র-মমতায় বাইরের ঘরটাকে ঠিক যেভাবে আঁকড়ে ধরে পড়েছিলেন, আমার ঘরের কোনটার ওপরও ওঁর ঠিক সেই ওজনের উদগ্র মমতা সঞ্চার হয়েছে! বরং মাত্রায় কিছু বেশী! ...তারপর আমার মানবীয়তার তরফ থেকে, কিছু ভাববার, বোঝবার, বলবার আছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে — একদম নিরুত্তর থাকাই ভাল। ...আর অপ্রিয় সত্যবাদীর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঐ যে টুটির মাংস ছিড়ে খাওয়া ওটার অর্থ, দেবত্ব বিক্রমের মহিমা প্রচার মাত্র, — আর কিছু নয়! সুতরাং বলবার আছে কি? আর শোনাবার লোকই বা কই।[৫]

মানুষ হল এক অপূর্ণসত্তার বুদ্ধিমান প্রাণী। কিন্তু তার পরিপূর্ণতার বাসনা অনিবার্য। সীমিত ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ আছে মানুষের কাছে। জীবন মানেই সংগ্রাম। জীবনে দুঃখ-দুর্দশা থাকবে, জীবনকে মানসিক শক্তি, বুদ্ধি ও মনন দ্বারা পরিচালিত করে প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল করার প্রচেষ্টাই মানবজীবনের প্রকৃত কাজ।

শৈলবালা ঘোষজায়ার জীবনে হতাশা নামক প্রত্যয়টি বাসা বাঁধতে পারেনি। বরং হতাশাকে তিনি জয় করেছেন। তার প্রমাণস্বরূপ পাই :

অভাগার এই হাসি, ছদ্মবেশী অশ্রুরাশি
কি জানিবে, হায় বন্ধু, তার ইতিহাস?
লাঞ্ছিত অদৃষ্ট সনে, বুঝিতে জীবন পণে
ক্লান্তি জুড়াবারে সৃজি, — ব্যঙ্গ পরিহাস!

... ...

হতভাগ্য এই হাসি! এরে বল ভালবাসি?

ধন্য ভালবাসা! — মোর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!
থাক কথা! কাজ নাই, — ভাল লাগে? ভাল তাই!
লহ অশ্রু বেদনা'র, শ্রদ্ধা নমস্কার।[৬]

লেখিকা 'শেখ আন্দু' উপন্যাসেও আন্দু'র চরিত্রটিও স্বপ্নচালিত কল্পনার জালে আবদ্ধ করে অঙ্কন করেছেন। লেখিকা যদিও হিন্দু কুলবধূ ছিলেন কিন্তু মুসলিম চরিত্র সৃজনেও তিনি অসাধারণ দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। 'শেখ আন্দু' উপন্যাস প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

তাঁর লেখায় এক শিল্প মননশীলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। অথচ সে সময়ের বড় বড় পণ্ডিতেরা তাঁদের ভাষায় একটি দু'টি লাইনে এই লেখিকা সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'প্রভাবতীদেবী সরস্বতী ও শৈলবালা ঘোষজায়া অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে নতুন ধারা প্রবর্তনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মোটের উপর সকলেই কমবেশি পুরাতন আদর্শ সংঘর্ষের যুগে পুরাতনেরই পোষকতা করেন।'[৭] বাঙালি সমাজ অসাম্প্রদায়িক কখনোই ছিল না। ইসলাম ধর্ম প্রচারের পূর্বে বৌদ্ধদের ওপরও নেমে আসে নির্যাতন। আবার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র পরিচালনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপরও নেমে আসে নির্যাতন। তবে ভারতবর্ষ যেহেতু হিন্দু প্রধান সে কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক ছিল। 'শেখ আন্দু' নিয়ে যে ক্ষোভ-অভিযোগ, তা ওই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী যাঁরা এবং যাঁরা বিজ্ঞানমনস্ক তাঁরা এ বিষয়ে বিরোধিতা করেননি।

> শিবনারায়ণ রায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতকে গ্রহণ করেননি, বরং তিনি বলেছেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি কতখানি অসার এবং ভিত্তিহীন তা পাঠক 'শেখ আন্দু' উপন্যাসটি পাঠ করলেই অবগত হবেন।[৮]

লেখিকার বয়স যখন ২৬ বছর তখন হঠাৎ তাঁর স্বামী সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান। তাঁর লেখা থেকে যে আয় হত তা দিয়েই তাঁর স্বামীর চিকিৎসার খরচ চালাতেন। এই সময় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-এর উপর গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে 'সরস্বতী' উপাধি পান। সাহিত্যচর্চার জন্য নদীয়ার 'মানদ মণ্ডলী' অযাচিতভাবে লেখিকাকে সাহিত্যভারতী ও রত্নপ্রভা (আনুমানিক ১৩২২ বঙ্গাব্দ) উপাধি দেন।

শৈলবালা ঘোষজায়ার দাম্পত্যজীবন সুখের ছিল না। বিয়ের প্রথম কয়েক বছর সুখের হলেও বাকি দিনগুলো ছিল কষ্টের-বেদনার-যন্ত্রণাতীত। ১৩২৬ থেকে লেখিকার জীবনে যে সংগ্রাম শুরু হয় তা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর জীবন ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। বাসস্থান, ব্যক্তিজীবন সবই বারবার বিপন্ন হয়। সে ইতিহাস যেমন করুণ, তেমনই মর্ম-স্পর্শী।[৯] শৈলবালা ঘোষজায়া অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার জন্য লেখালিখিতে আরও সক্রিয় হন। তখন তিনি আর লোকনিন্দা এবং পারিবারিক অসন্তোষকে আমল দিতেন না। লেখা প্রকাশ করতেন। এ প্রসঙ্গে সৌরীন ভট্টাচার্য বলেন :

> শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখালিখির কথায় এ অবশ্যই খেয়াল করা দরকার যে, তিনি লেখা থেকে রোজগার করতেন। এবং যতটুকুই হোক সে রোজগারের তাঁর খুবই প্রয়োজন ছিল। অসুস্থ মানসিক রোগগ্রস্ত স্বামীর চিকিৎসার ভার তাঁকে সামলাতে হত। লেখা তাঁর কাছে অবশ্যই শুধু সময় কাটাবার ছল নয়, তা হয়ত কোনও লেখকের জন্যই নয়, কোনও লেখার জন্যই তা নয়। লেখা পর্যন্ত একটা কথাকে নিয়ে যেতে গেলে অন্য অনেক কিছুর থেকে সময় বাঁচিয়েই তবে যেতে হয়। আর শৈলবালা ঘোষজায়ার পক্ষে সে কথা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি...।[১০]

স্বামী জমিদার বংশের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও পাকেচক্রে সম্পত্তির আয় থেকে বঞ্চিত। বছর দশেক ভাল ছিলেন নরেন্দ্রমোহন, তারপরই স্বয়ং চিকিৎসক নিজেই মানসিক চিকিৎসার রোগী হয়ে গেলেন। একেবারে বদ্ধ-উন্মাদ। তখন লেখিকার সাহিত্যচর্চা তাঁর দুচোখের বিষ। অবারিত চিৎকার চেঁচানিতে লেখিকার জীবন দুর্বিষহ। তাঁকে কখনও যান খুন করতে, কখনও বলেন, আমার লেখা, সব আমার লেখা। তোমার নয়। তোমাকে আমি খুন করব — মেরে ফেলব। বাস্তবিকই একদিন প্রায় খুন করেই বসলেন। একবার এত জোরে আঘাত করলেন যে, তারপর থেকেই চিরজীবনের মতো লেখিকার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এল। জীবনে নেমে এল দুর্দিন। এ প্রসঙ্গে লেখিকা নিজেই বলেছেন :

> ১৯২৭ সালে আমার জীবন সবচেয়ে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। স্বামী ঘোর উন্মাদ—দুর্দান্ত। সেই সুযোগে আত্মীয়রা সম্পত্তির ভাগ ঠকিয়ে নিচ্ছে। আমার ওপর চলছে অমানুষিক অত্যাচার। আমার স্বামী মাথায় এমন জোরে আঘাত করলেন যে মনে হল চোখ দু'টো বুঝি ঠিকরে বেরিয়ে এল। ক্ষীণ হয়ে গেল দৃষ্টিশক্তি, উঃ মাথায় কী যন্ত্রণা![১১]

এই অসহনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন তাঁর দাদা মেজর অশ্বিনীকুমার নন্দী, পুলিশের সাহায্যে তাঁকে তাঁর বর্ধমানের বাড়িতে নিয়ে আসেন। লেখিকা এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, 'সেই সময়, সারা জীবনের মধ্যে সেই একবারই আমি ভেঙ্গে পড়েছিলাম — ভগবানে বিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ...আমি শান্তির জন্য, নিজেকে জয় করবার জন্য সাহিত্যচর্চা করতাম।'[১২]

আশাপূর্ণা দেবী, কৃষ্ণভামিনীদের মতো লেখিকাও শ্বশুরবাড়ির লোকদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। শৈলবালা ঘোষ থেকে শৈলবালা ঘোষজায়াতে রূপান্তরিত হলেন।

এ প্রসঙ্গে সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে লেখিকা নিজেই বলেছিলেন, 'আমি নামের পর ঘোষজায়া কেন লিখি জান? শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে, আমিই ওদের নতুন বউ শৈলবালা ঘোষ। ওসব লেখা টেখার ওরা ধার ধারত না, খবরও রাখত না।'[১৩] কী প্রতিকূল পরিবেশে শৈলবালাকে সাহিত্যসাধনা করতে হয়েছিল তার কিঞ্চিৎ আভাস এই উদ্ধৃতি থেকে উপলব্ধি করা যায়। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে শাশুড়ির মৃত্যুর পর তিনি মেমারিতে ফিরে যান। তার ৩ বছর পরে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। শাশুড়ি ও স্বামী মারা যাবার পর মেমারিতে সম্পর্কটাই ছিল মাত্র। মন ছিল না। তারপর একসময় সব পাট চুকিয়ে, এলেন স্বামী অসীমানন্দের আশ্রমে। এবার বিবাহিত জীবনের শেষ বন্ধনটুকুর অবসান ঘটল। তবুও এ কথা তিনি কোনোদিনই ভুলতে পারেননি যে, একদিন তাঁর স্বামীই তাঁর সাহিত্যচর্চাকে হাত ধরে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কুন্তলীন পুরস্কারের দেখাদেখি অনেক কেশতৈল প্রস্তুতকারী সংস্থা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এসেছিলেন। আত্মীয়দের মানসিক অত্যাচার তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। আশ্রমে যাওয়ার পরও তাঁর মনে বারবার হতাশা নামক প্রত্যয়টি হানা দিতে থাকে।

১৯৬২ সালে তাঁর সঙ্গে সুধীরঞ্জনের সাক্ষাৎকার যখন প্রকাশিত হয় তখন শৈলবালা ঘোষজায়া বলেছিলেন, 'আরে আমি কবে মরে ভূত হয়ে গেছি! এখন কবর খুঁড়ে কী পাবে তুমি?' সুধীরঞ্জন আরও বলেন, 'সৌভাগ্যবশত লেখায় মূল্যবান কিছু থাকলে তা লেখক/লেখিকাকে বিস্মরণ নামে মৃত্যুর হাত থেকে বারে বারেই পুনরুদ্ধার করে। সেজন্য তাঁর জীবদ্দশায় শৈলবালা ঘোষজায়া তার কৃতির জন্য কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।'[১৪]

লেখিকার নামের সঙ্গে জায়া লিখে পরিবর্তনের পিছনে ভীরুতা প্রধান কারণ বললে ভুল হবে, বরং বাহবা জানাতে হবে যে, সেই যুগে দাঁড়িয়ে নানা প্রতিকূল-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও সবকিছুকে উপেক্ষা করে তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে একের পর এক অবিস্মরণীয় রচনা। সমালোচনার ঝড় আসা সত্ত্বেও

লেখিকা বেশ কয়েকটি গল্প, উপন্যাস এমনকি গোয়েন্দা-প্রধান রহস্যমূলক রচনা, শিশুতোষ গল্পকাহিনী ও গবেষণামূলক নিবন্ধও লিখেছেন। স্বামীর মস্তিষ্ক বিকৃতির যন্ত্রণা, সংসারের জটিলতা, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, অনুকূল পরিবেশ, শ্বশুরবাড়িতে কূটকথা এসব কিছুর মধ্যেও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি থেমে থাকেনি। জীবনের চরম জটিলতার সম্মুখীন হয়েও হার মানেননি কখনোই। স্বামী মারা যাবার পর অনেক দায়-দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয় অথচ এ দায়িত্বটুকুও তাঁকে অশান্তির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। বাধ্য হয়েছেন আশ্রমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার। সে সময় বঙ্গসাহিত্যে অন্যান্য লেখিকাদের মতো যে শুধু সমালোচনায় দায়ভার নিতে হয়েছে তাঁকে তা নয়, প্রশংসাও পেয়েছেন।

বিধি-নিষেধ ও তাঁদের ইচ্ছা-পছন্দের গণ্ডির মধ্যে বন্দি হয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন যে আর হয়ত লিখতে পারবেন না — শৈলবালা ঘোষজায়ার ভাষ্যে, ‘সেই সময়, সারা জীবনের মধ্যে সেই একবারই আমি ভেঙে পড়েছিলাম — ভগবানে বিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল।’[১৫] সংসারের জটিলতা পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে লেখিকা প্রায় ভেঙেই পড়েছিলেন। নিজের শান্তির জন্য, নিজেকে জয় করবার জন্য তিনি আবার সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোযোগ দেন। সংসারে এতটুকু সুখের মুখ দেখতে পাননি লেখিকা। কেননা উন্মাদ স্বামীর চিকিৎসা আর সেবা-যত্নের জন্যে দশটা বছর ফুরিয়ে গেল। তবুও বাঁচানো সম্ভব হল না নরেন্দ্রমোহনকে।

সুফিয়া কামালের (১৯১০-১৯৯৯) স্বামী নেহাল চৌধুরী মারা যাবার পর তিনি যেমন হতাশায় ভুগছিলেন, নতুন কোনও সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিলেন, ‘পাহাড়ে পড়ে মনে’ (১৯৩৫) কবিতা সেরকমই তাঁর মনের অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ,

> কুহেলী উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী
> গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে রিক্তহস্তে।
> তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে।[১৬]

আবার অনিতা অগ্নিহোত্রীর (১৯৫৬) মনের কথার সঙ্গেও লেখিকার মনের অবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায় :

> তুমি আমাকে যেমন রেখেছ আমি তেমন আছি
> শিকড়ের কোল ঘেঁষে রাঙ্গা বটফলের মতন।
> রোদে, বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দে, কান্নায় ঘামে
> গরুর গাড়ির চাকায় পিষ্ট মাটিতে মুখ ঘ'ষে
> ... ...
> তুমি কেমন আছ, কোনও দিন জিজ্ঞেস করো না এই কথা
> আমাকে যেমন রেখেছ; আমি তেমনিই আছি ঠিক তেমন।[১৭]

সুফিয়া কামাল ও অনিতা অগ্নিহোত্রীর কবিতার মনের অভিব্যক্তিগুলো ঠিক যেন শৈলবালা ঘোষজায়ার মনের অভিব্যক্তির মতো। কেননা লেখিকার ‘জন্ম-অভিশপ্ত’ উপন্যাসটিতে মনের যন্ত্রণাতীত কষ্ট যা লেখিকার অবচেতনাংশে, যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায় তাতে মনে হবে লেখিকার যন্ত্রণাদগ্ধ মনের কথাগুলোই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

অস্তিত্ববাদ হচ্ছে এমন একটি প্রত্যয় যেখানে মানবজীবনের বহুমুখী সমস্যা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না প্রভৃতি মিলে পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন, জগতের যে কোনও বস্তু বা ঘটনার ক্ষেত্রে নয় বরং মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। তবে তা ব্যক্তিমানুষের আলোচনা করলেও সামাজিক মানুষ বা সমষ্টিগত মানুষের প্রতি

অবজ্ঞা করে না। কেননা বিশেষের সমন্বয়েই সার্বিক গঠিত হয়, তাই বিশেষ বিশেষ মানুষের অস্তিত্বকে আলোচনায় আনলে পুরো মানবসমাজই আলোচনায় চলে আসে। মানবতাবাদী আবেগ, নৈতিকতা, ভোগ, ধর্মীয় চিন্তা বা বোধ, ভয়ভীতি, দুর্বলতা, নিজস্ব স্বাধীনতা ও স্বাধীন সিদ্ধান্তের দায়ভার অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি অস্তিত্ব প্রত্যয়ের অন্তরালে আবদ্ধ। লেখিকা ‘শেখ আন্দু’ উপন্যাসে আন্দু’র চরিত্রের মাধ্যমে এই প্রত্যয়গুলো মানব সমাজের সম্মুখে নিয়ে এসেছেন। লেখিকা ইচ্ছা করলেই নিজের ধর্মের পুরুষচরিত্রের মধ্যে তা আনতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা’ না করে বরং অসাম্প্রদায়িকতার আড়ালে আন্দুকে এরকম অস্তিত্ববাদের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করলেন। এটাই লেখিকার অন্যান্য লেখকদের চেয়ে আলাদা ভঙ্গিমা :

> বাহ্য-ব্যবহার রীতি স্থূল-স্বতন্ত্র বিধানটা যতই নিরস যতই কঠিন হোক, — চরিত্রমাধুর্যে সর্বজনপ্রিয় আন্দু, স্বাভাবিক সরল-সৌহার্দ্যে সকল শ্রেণীর (শ্রেণির) লোকের সহিত মিশিয়া বেশি বুঝিয়াছিল, এ ব্যবধানের বিধানটা নিতান্তই বহিঃসীমাবদ্ধ বাহিরের লৌকিক ব্যাপার মাত্র! মানুষের অন্তরে পবিত্র নির্মল অন্তরঙ্গতার অসীম মিলন ক্ষেত্রে, প্রাণবন্ত মানুষের প্রাণশক্তির গতি চির অপ্রতিহত।[১৮]

মানুষের মাঝেই মানবিক গুণাবলি রয়েছে যা তার অস্তিত্বকে সার্থক করে তোলে। আর এ গুণাবলির পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ সৎ ও অসৎ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। লেখিকার সাহিত্যসৃষ্টির চরিত্রগুলো এরকম গুণাবলি দ্বারাই চিহ্নিত হয়েছে। ‘লাফো’ গল্পে লাফো, ‘শেখ আন্দু’ গল্পের আন্দু, ‘নমিতা’ উপন্যাসের সুরসুন্দর তেওয়ারী ও মিস স্মিথ, ‘অনন্তের পথে’ উপন্যাসের পরাশর, ‘বিজয়া নমস্কার’ গল্পের ব্যথা, ‘ননী খানসামার ছুটি যাপন’-এর ননী হাজরা প্রভৃতি চরিত্রগুলো অপরের দ্বারা চিহ্নিত মানবীয় গুণাবলির সৎচরিত্র। আবার ‘ভণ্ডের সার্থকতা’ গল্পের মহাদেবের মত ঠগ, বাটপাড় চরিত্রেরও সৃষ্টি করেছেন। লেখিকার ভাষ্যে :

> উদ্ধারের আবার পথ থাকে না? সবদিকেই পথ! তবে ধার্ম্মিক পরমহংস হয়ে চলতে গেলে কোনদিকে পথ দেখতে পাবেন না। নইলে বুদ্ধি থাকলে দেখতে পাবেন, পকেট খালি থাক আর ভর্তি থাক, পয়সা চারিদিক ছড়ানোই রয়েছে, শুধু কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। উপার্জ্জনের পথে ধর্ম্মজয়, চক্ষুলজ্জা থাকলে উপার্জ্জন হয় না।[১৯]

‘আবার কোন রোগ?’ নামক গল্পে ১৪ বছর বয়সের বিহারীলালের মুখ দিয়ে বলতে শুনি :

> আর আমাদের দেশের পুলিশের কর্ত্তারা? এঁরা শুধু তিনটি গুণ দেখে — যত রাজ্যের গুণ্ডাকে পুলিশের কনস্টেবলীতে ঢোকান। একটি গুণ, সে মনুষ্যত্বহীন, ‘পাহাড়ে’ বজ্জাত কি না? দ্বিতীয় গুণটি সে সাফাই হাতে ঘুষ নিয়ে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, চাপাতে জানে কি না? তিন দফার গুণ, সে বিনা প্রমাণে সন্দেহমাত্রেই নিরাপরাধ ভদ্রলোকের ছেলের গলায় হাত দিয়ে পারে কিনা! এই তিনটি গুণ থাকলেই ব্যস কেল্লা মার দিয়া।[২০]

তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মিশেলের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি অপ্রত্যাশিত লক্ষণও পাওয়া যায় তা’ হল চণ্ডতা, ভায়োলেন্স। ‘বিজয়ার নমস্কার’ গল্পে মাত্র তিনটি নিরলঙ্কার বাক্যের মধ্যে ভায়োলেন্স, যা বাংলা গল্পের জগতে খুব চালু ব্যাপার নয়। লেখিকা এই অসাধ্য জিনিসকে সাধ্য করেছিলেন, ‘ছোট ভাই এক ক্যাঁচা আনিয়া ব্যথার স্বামীর কাঁধে আঘাত করিল। ব্যথার স্বামী এক ধারালো কাটারীর আঘাতে ছোট ভাইয়ের মুণ্ডু স্কন্ধচ্যুত করিয়া ফেলিল। বড় ভাই কাটারী কাড়িয়া ব্যথার স্বামীর পা জখম করিয়া দিল।’[২১]

তাঁর ‘লাফো’ গল্পেও ভায়োলেন্স ব্যবহারের বড় নজির। আশ্চর্য এক সমাপতন, ‘আমার চোখে তখন জগৎ জুড়িয়া খুনাখুনীর মেলা বসিয়া গিয়াছে, চারিদিক হইতে ফিনকি দিয়া রক্তের উৎস ছুটিতেছে, আমার রক্ত-লোলুপ চিত্তে এক রাক্ষসী যেন হুঙ্কার করিয়া উঠিল! দুই হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে শানিত ভোজালী ধরিয়া, আমি চক্ষের নিমেষে তাহার স্কন্ধে বসাইয়া দিলাম।’[২২] আবার সেই লাফোকে তার এই কৃতকর্ম সম্পর্কে বলতে শুনি, ‘বাবু সাহেব, পৃথিবীর মধ্যে যাহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতাম, তাহাকেই নিজের হাতে খুন করিয়া — ঐ গাছের তলায় তাহার মাথা পুঁতিয়া রাখিয়াছি। এই বিজয়া দশমীর তিথিতে — যে ঠিক আজ পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হইল।’[২৩] লেখিকা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে একজন ব্যক্তিকে ভাল-মন্দ দুই প্রকৃতির করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

লাফো’র চরিত্রকে যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) ‘প্রাগৈতিহাসিক’ (১৯৩৭) গল্পের ভিখুর চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে পার্থক্য এতটুকুই যে, লাফোর দ্বারা লেখিকা ভায়োলেন্স ও মানবিকতা দেখিয়েছেন আর ভিখু’র মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু ভায়োলেন্স দেখিয়েছেন, মানবিকতা বলে কোনও গুণাবলি তার মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করেননি। আর এখানেই লেখিকার সার্থকতা। আবার ভায়োলেন্স বলতে যদি সরাসরি মোকাবিলা করার চেষ্টা বুঝি কিংবা সামনাসামনি সমস্যার মুখোমুখি হওয়া, প্রতিকূল অবস্থায় রীতিমত চড়াও হওয়া, তাহলে বলতে হয় লেখিকার হাতে ভায়োলেন্স অন্য চেহারাতেও খেলা করে। যার প্রমাণ ‘বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল’ গল্পে ডেপুটিবাবু হাকিম দেবীপ্রসাদকে শায়েস্তা করার মধ্যে :

> হাকিম সাহেব হুঙ্কার দেন, যা খুশি করছ, জানো, তোমার মাথা ভেঙ্গে ফেলব, রক্তারক্তি করব। এর উত্তরে হাতে রুল তুলে নিয়ে গৃহিণী ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিতে পারেন, যা পারো কর, কিন্তু মাতালকে জব্দ করতে আমিও জানি! আমি তোমার মাথাও ভাঙব না, রক্তারক্তিও করব না, খুনও করব না, কিন্তু এই রুল ছুঁড়ে তোমার পায়ের গোছে এমন মারব যে, পনেরো দিন যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে না পার! ...তর্জনী তুলে দারোয়ানকে বললেন, তুমি আমার বাপের বয়সী বুড়ো মানুষ, হুঁশিয়ার হয়ে ইজ্জত বাঁচিয়ে চলো, মাতালের আড্ডায় যেতে হচ্ছে, সাবধান থেকো, — হুকুম দিয়ে রাখছি, যাঁহাতক বেয়াদবি দেখবে, বে-দরদে লাঠি চালিও, তারপর মামলাবাজীর ঠেলা সামলাবে তোমার ডেপুটি মনিব! চলো ঐ নাচের মজলিশে।[২৪]

দজ্জাল মহিলার এই গল্পটি হাসির নক্সাগল্প হতে পারত। অথচ লেখিকা ভায়োলেন্সের জোরে এ গল্পের জাত বদলে দিয়েছেন। এটাই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির চমৎকারিত্ব।

পৃথিবীতে কোনও মানুষই পূর্ণ নয়। কোনও কোনও দিকে তার অপূর্ণতা থেকেই যায়। আর সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্য তার মন সবসময় বিচলিত থাকে। সে এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করে। মানুষের জীবনে যে স্তরে অনুভূতি রয়েছে সেই স্তরেই পূর্ণতা খোঁজে। নৈতিক স্তরের জীবন হল দায়িত্ববোধ, দৃঢ়সংকল্প ও নিরপেক্ষতা। অথচ মানবজীবনের এই নৈতিকতার বাইরেও একান্তভাবে ইন্দ্রিয়সুখ রয়েছে, যার অভাবে ব্যক্তির জীবনে পূর্ণতা আসে না।

এই ইন্দ্রিয় সত্তার অভাবে মানুষের মনে দ্বান্দ্বিকতার দোলাচলবৃত্তি ঘটে। লেখিকা দর্শন ও বিজ্ঞানকে একত্র করে ইন্দ্রিয় সত্তাকে অনুগ্রহ করেছেন কামনা-বাসনার ক্ষেত্রে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ বাস্তবতায় যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, দৈহিক ক্ষুধা নামক যে জৈবিক সত্তা রয়েছে তা মানুষের জন্য অপরিহার্য, তা লেখিকা আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। জীবনের চরম সুখ খুঁজতে গিয়ে মানুষ নৈতিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তথাপিও যৌনক্ষুধা ব্যতীত মানুষ জীবনে পূর্ণতা পায়

না। তারই আভাস পাওয়া যায় ‘অনন্তের পথে’ উপন্যাসে :

> নৈতিক চেতনা নিষ্ক্রিয়। কি শুনিতেছেন, কি বলিতেছেন, হয়তো ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। ... তাহা পূরণের অনুকূল অবস্থা আপনা আপনি উপস্থিত দেখিয়া — বাধা দিতে ইচ্ছা হইল না। বরঞ্চ কতকটা অজ্ঞাত ভয় ও কৌতুহল উত্তেজনার সহিত তাহাতে সায় দিয়াই চলিলেন।[২৫]

রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তৎকালীন সমাজে ধর্মকে শিখণ্ডী করে রাজনৈতিক নেতাগণ নানা ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নেন। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির বসবাস শাশ্বতকালের। এই সম্প্রীতির শুভবোধ লেখিকার ভেতরে অঙ্কুরিত হয়েছে তাঁর পরিবার ও পরিবেশ প্রতিবেশের আবহাওয়া থেকে। তিনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশি। সে সূত্রে তাঁর ভেতর বাঙালিত্বের সম্প্রীতির একটি মানসিকতার উন্মেষ ঘটে। হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব আর প্রতিযোগিতার অশুভ তৎপরতাও পর্যবেক্ষণ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই অসাম্প্রদায়িকতার চেতনার বীজ এবং সমাজ সংস্কারের প্রতি আকাঙ্ক্ষা আর অসহায় নারীদের পরিস্থিতি তাঁর লেখাতে প্রকাশ পাবেই। লেখিকাকে প্রগতিশীল বললে ভুল হবে না। কেননা তিনি যে সকল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাতে নারীকে সচেতনতা ও সফলতার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন।

তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী’র ভাষ্য :

> ‘শৈলবালা ঘোষজায়া’-এর আটত্রিশটি বইয়ের নাম আমার সামনে আছে। তিনি জানিয়েছেন বহু অপ্রকাশিত উপন্যাস, মাসিকপত্রে প্রকাশিত অথচ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত উপন্যাস, আত্মজীবনী ও ছোটগল্প তাঁর কাছে আছে। বিস্তৃত আত্মজীবনীটি কোন প্রকাশক প্রকাশ করলে শৈলবালা খুশি হতেন। বইয়ের সংখ্যা ৫২/৫৩ হলেও ওসব বইয়ের নাম আজ আর তাঁর স্মরণে নেই।[২৬]

‘শৈলবালা ঘোষজায়া গল্পসংকলন’-এর (প্রথম প্রকাশ; ২০০০) সংকলন বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ শিরোনামের লেখায় অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী উল্লেখ করেছেন :

> শৈলবালা ঘোষজায়া গ্রন্থপঞ্জি অংশে আমরা অবশ্য অনেক চেষ্টা করেও ২২টি উপন্যাস ও ৯টি ছোটগল্পের সংকলন, ১টি নাটক এবং ২টি শিশু সাহিত্যের বইয়ের নাম উদ্ধার করতে পেরেছি, অনেকের সঙ্গে মিলিত ভাবে লেখা একটি বারোয়ারি উপন্যাসের নামও এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ মোট ৩৫ টি বইয়ের নাম পাওয়া যাচ্ছে।[২৭]

তবে একথা ঠিক ‘শেখ আন্দু’ লিখে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে সমালোচকের তীরে। হয়ত কোনও পুরুষ লেখকের সৃষ্টি হলে, সেটি যুগান্তকারী রচনা হিসেবে পরিচিত হত। সমালোচনাও কি আর সর্বদা নিরপেক্ষ হয়? তিনি বোধহয় অন্য অনেকের মতো মননশীল পরিবেশের সাহায্য পাননি। পাননি বোধ হয় শহুরে বিদ্বৎজনের সান্নিধ্যও। আর কলকাতার সঙ্গে কোনোভাবে জড়িয়ে না থাকার জন্য আজকের দিনে তিনি প্রায় ভুলে যাওয়া একটি চরিত্র।

তাঁর অনুসন্ধানী উপলব্ধির ভাষাতেও রয়েছে হতাশার আবহ। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নারীসমাজকে নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে এতটাই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেন যে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতার অবিকল্প প্রতিবিম্ব হয়ে উঠল। পুরুষশাসিত সমাজে উপেক্ষা আর অবহেলার শিকার নারীজাতির অবমাননায় ব্যথিত লেখিকা নানা রকম সমাজসেবামূলক কাজেও নিজেকে জড়িয়ে রাখলেন, মহিলাদের উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদার লক্ষ্যে স্ত্রী-শিক্ষা, কিংবা তাদের স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলার

উদ্যোগ নিয়ে শামিল হলেন নানা কর্মকাণ্ডে।

তাঁর নিজস্ব সম্পদ বলতে অফুরান আত্মপ্রত্যয়, জেদ, নিষ্ঠা, আত্মসম্মানবোধ আর সৃজনশীলতায় আত্মস্থ হয়ে অবিরাম অনুশীলন। জীবনের প্রান্তবেলায় পৌঁছে অবশ্য কিছু স্বীকৃতি জুটেছিল। পেয়েছিলেন সরস্বতী, রত্নপ্রভা, সাহিত্যভারতীর মতো সম্মান। যদিও ব্যক্তিজীবনের বিষাদখিন্ন স্মৃতিতাড়িত শৈলবালা ঘোষজায়া তেমন আপ্লুত নন, বয়সের ভারে নানা শারীরিক সমস্যা, পারিবারিক সংকট, আর্থিক অনটন, একাকিত্বে জর্জরিত কথাশিল্পীকে পঁচাত্তর বছর বয়সে আশ্রয় নিতে হয় আসানসোলে, ভাসুর মুরারি ঘোষের নাতি শ্যামসুন্দর ঘোষের বাড়িতে। অপরাহ্নবেলায় অনেকখানি স্বস্তি শ্যামসুন্দর ও তাঁর স্ত্রী ভারতীর আতিথেয়তা। ১৯৭৪ এর ২১ সেপ্টেম্বর আশি বছর বয়সে সেখানেই প্রয়াত হলেন জীবনশিল্পী।

প্রতিভাবান এই নারী লেখিকা প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশাতেই হাল আমলের বাঙালি পাঠকমনে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পর (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪) অধুনালুপ্ত 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য অনেক খবরের ভিড়ে মিশে যাওয়া সংবাদ কণাটি সেই সার্বিক বিস্ফোরণের পরিচয়ই বহন করে, 'গত ২৯ সেপ্টেম্বর 'সাহিত্যিকা'র উদ্যোগে শৈলবালা ঘোষজায়ার স্মরণে একটি আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই স্মরণ সভায় লীলা মজুমদার ও মহাশ্বেতা দেবী ভাষণ দেন।'[২৮] আবার :

> আশ্চর্যের বিষয়, 'দেশ'-এর মতো জনপ্রিয়, উচ্চাঙ্গের একটি সাহিত্যপত্রিকায় শৈলবালা ঘোষজায়ার প্রয়াণ-সম্পর্কিত কোনো প্রতিবেদনই প্রকাশিত হয়নি — আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে (১৯৭৫) প্রয়াত বাণী রায়ের পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরিবালা দেবী এবং জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাবলী রামায়নী প্রকাশভবন থেকে পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। শৈলবালা ঘোষজায়ার উপন্যাস বা ছোটগল্প সংকলনের কোনো পরিকল্পনা এই সময়ে হয়েছিল কিনা জানা যায় না।[২৯]

যে লেখিকা হিন্দু কূলবধূ হয়ে মুসলিম সমাজকে নির্ভয়ে তার সাহিত্য সৃষ্টিতে টেনে আনতে পেরেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সে খবরটুকুও এমনভাবে প্রকাশিত হওয়া সত্যিই অকল্পনীয়। তবে এতটুকু বলা যেতে পারে লেখিকা সাহিত্য সৃষ্টিতে জীবন জটিলতার সহজ উপায় দেখিয়েছেন। একজন নারী হয়ে এমন অসাধ্য কাজ সত্যিই ভেবে পাওয়া যায় না। আর তাঁর সৎসাহস, মুক্তবুদ্ধি, উজ্জ্বল কল্পনার জন্যই তাঁর সাহিত্যকর্ম আজ হারিয়ে যাওয়ার পরেও খুঁজে বার করার চেষ্টা চলছে। সমগ্র সাহিত্য জগতে শৈলবালা ঘোষজায়া 'শেখ আন্দু'-র ঔপন্যাসিক হিসেবে চিহ্নিত। তবে তাঁর অন্যান্য লেখাগুলোও যে 'শেখ আন্দু'র মতো শৈল্পিক মানে উন্নীত, তা অনায়াসে বলা যায়। আজকের সাম্প্রতিক অসহিষ্ণুতার আবহে ভাবতে অবাক লাগে আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে এক কুড়ি বছরের বউ মেমারি গ্রামে বসে লিখছেন সম্প্রীতির পাঠ, স্বপ্ন দেখছেন জাতি ধর্মের উপরে উঠে এক মুক্ত ভারতের। সেখানেই আমরা কুর্নিশ করতে বাধ্য হই তাঁকে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১ কাজী নজরুল ইসলাম, *সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থ*, নারী কবিতা থেকে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে।

২ সৌরীন ভট্টাচার্য (ভূমিকা), অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্পসংকলন*, পাঠশালার স্মৃতি, দে'জ পাবলিশিং ২০০০ (স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), কলকাতা, ২০০০, পৃ.১৯৮।

৩ সৌরীন ভট্টাচার্য (ভূমিকা), তদেব, পৃ.১৯৯।

৪ শিবনারায়ণ রায়, শৈলবলা ঘোষজায়া ও শেখ আন্দু, *চতুরঙ্গ*, শ্রীমতি নীরা রহমান কর্তৃক পি এস বাক্‌চি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

৫ শৈলবলা ঘোষজায়া, *জন্ম অভিশপ্তা*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্‌, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ.২৪।

৬ সৌরীন ভট্টাচার্য (ভূমিকা), অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্পসংকলন*, বিজয়ার নমস্কার, দে'জ পাবলিশিং ২০০০ (স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), কলকাতা, ২০০০।

৭ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৮ ড. শিরীণ আখতার (সম্পা.), তদেব, পৃ.১০।

৯ সৌরীন ভট্টাচার্য, *তদেব*, পৃ.১২।

১০ সৌরীন ভট্টাচার্য (ভূমিকা), তদেব, পৃ.৬।

১১ শিবনারায়ণ রায়, *শৈলবালা ঘোষজায়া ও শেখ আন্দু*, তদেব, পৃ.৩৪।

১২ শিবনারায়ণ রায়, *তদেব*, পৃ.৩৫।

১৩ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ.২১৩।

১৪ সুধীর মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ.৩৩।

১৫ শিবনারায়ণ রায়, *তদেব*, পৃ.৩৪।

১৬ সুফিয়া কামাল, *সাঁঝের মায়া*, কাব্যগ্রন্থের 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা থেকে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে।

১৭ অনিতা অগ্নিহোত্রী, *মিলন সাগর*, সূচিপর্বের, 'তুমি কেমন আছ' কবিতা থেকে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে।

১৮ ড. শিরীণ আখতার (সম্পা.), *তদেব*, পৃ.৫৪।

১৯ সৌরীন ভট্টাচার্য, *তদেব*, ভণ্ডের সার্থকতা, পৃ.৫৩-৫৪।

২০ সৌরীন ভট্টাচার্য, *তদেব*, কোন রোগ?, পৃ.১৮০-১৮১।

২১ সৌরীন ভট্টাচার্য, *তদেব*, বিজয়ার নমস্কার, তদেব, পৃ.৩৮।

২২ সৌরীন ভট্টাচার্য, *তদেব*, লাফো, তদেব, পৃ.১৪০।

২৩ সৌরীন ভট্টাচার্য, *তদেব*, পৃ.১৩৩।

২৪ সৌরীন ভট্টাচার্য, *তদেব*, বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল, তদেব, পৃ.১৭৮-১৭৯।

২৫ শৈলবালা ঘোষজায়া, *তদেব*, বিভ্রাট, পৃ.৮১।

২৬ ১৯৭২ সালের ২৬ নভেম্বর রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে য়ুনিভার্সিটি উইমেন অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে বিগত দিনের ছ'জন বর্ষীয়সী লেখিকাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ...সাহিত্যিকা পরিচিতি লিখেছিলেন শ্রদ্ধেয় মহাশ্বেতা দেবী। শৈলবালা ঘোষজায়া সম্পর্কে পরিচিতিতে তিনি যা বলেছেন — সেখান থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা।

২৭ সৌরীন ভট্টাচার্য, *তদেব*, পৃ.১৩।

২৮ অমৃত, (১৪ বর্ষ : ২৪ সংখ্যা), ১৮ অক্টোবর, ১৯৭৪, কলকাতা।

২৯ সৌরীন ভট্টাচার্য, *তদেব*, পৃ.১৩।

ইয়াসমিন সুলতানা : কবি, প্রাবন্ধিক এবং বীরগঞ্জ সরকারি কলেজ (বাংলাদেশ)-এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।